ত্রয়োদশ অধ্যায়

# নগরায়নের ইতিহাস

প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ভিত্তিতে খ্রীষ্টপূর্ব 500 থেকে খ্রীষ্টিয় 1000 পর্যন্ত নগরায়নের ইতিহাসের একটি রূপরেখা রচনা করা যায়। নগরের সংজ্ঞা নিরূপণ করা কঠিন। ব্রোঞ্জ যুগের সংস্কৃতির ভিত্তিতে কোনও কোনও প্রত্নতত্ত্ববিদ বলেছেন, বড় আয়তন ও জনসংখ্যা নগর গঠনের প্রয়োজনীয় উপাদান ছিল কিন্তু শিল্প ও ব্যবসার এখানে বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। অন্য মতানুসারে হরপ্পা যুগের নগরজীবনে ব্যবসার ভূমিকা ছিল মুখ্য। অতএব কোনও নগরকে চিহ্নিত করার সময়ে শুধু তার আয়তন, জনসংখ্যা ও কৃষির গুরুত্ব নিরূপণ নয়, কোন কোন বৃত্তির মানুষ সেখানে বসবাস করে তার পরিচয় অনুধাবন করাও প্রয়োজন। কৃষির সঙ্গে যুক্ত নয় মূলত এমন মানুষই নগরে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু নগরের পশ্চাদ্‌ভূমিতে বসবাসকারী মানুষ যদি বৃহদাকার খাদ্য-উৎপাদনকারী অর্থনীতি গড়ে তুলতে না পারে ও তাদের উৎপাদন থেকে নগরে খাদ্যাদি যোগান দিতে না পারে, সে ক্ষেত্রে নগরে বিশাল জনসংখ্যার বসবাস অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রাচীন ভারতের নগরগুলিতে শিল্প ও ব্যবসার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সেইজন্য এই ধরনের নগর চিহ্নিত করতে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রমাণের অনুসন্ধান প্রয়োজন। সেই সঙ্গে জানা প্রয়োজন সাহিত্যগত সাক্ষ্যে নগরের উল্লেখ আছে কিনা। নগর ও গ্রামাঞ্চলের বস্তুগত জীবনেও কিছু পার্থক্য অবশ্যই ছিল। একথা ঠিক যে নগর ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই সামাজিক বৈষম্য ছিল। কিন্তু এমন কিছু মূল্যবান বস্তু ছিল যা শুধু সমৃদ্ধ নগরবাসীই ব্যবহার করত। এই ধরনের জিনিস হয়ত গ্রামেও ব্যবহৃত হত কিন্তু মনে হয় নগরের মত অত ব্যাপক হারে নয়। নগরের বস্তুগত জীবনযাত্রার মান গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানের চেয়ে উন্নততর ছিল।

নগর কাকে বলা যায় ও নগরের উৎপত্তি কেমন করে হয় এ দুটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন। নগরের উদ্ভব যে কারণেই হোক না কেন, সেখানে একটি বাজার থাকে ও কারিগরদের সমাবেশ হয়। অনেক কারণে নগরের উদ্ভব হতে পারে। কোনও স্থানে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হলে অথবা প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপিত হলে তা একটি নগরের রূপ নেয়। স্থায়ী সামরিক ছাউনিও নগরে পরিণত হতে পারে। যাতায়াতের কোনও মুখ্য কেন্দ্রেও নগর প্রতিষ্ঠা সম্ভব। বহুসংখ্যক শিল্পী ও কারিগর যেখানে সমবেত হয় সেখানে অবশ্যই নগর গড়ে ওঠে। তীর্থস্থান অথবা বিখ্যাত মন্দিরকে কেন্দ্র করেও নগর গড়ে উঠতে

পারে। তবে একথা ভুল যে প্রাচীন যুগের নগরজীবন ছিল মন্দিরকেন্দ্রিক। মধ্যযুগে বড় মন্দির বা মঠের গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি কিন্তু প্রাচীন যুগে নগর-জীবনের ক্ষেত্রে এদের গুরুত্ব ছিল সামান্যই। গুপ্ত যুগের পূর্বেকার মন্দির সেরকম চোখে পড়ে না। সে যুগে বৌদ্ধ মঠ অবশ্যই ছিল কিন্তু সেগুলি ছিল নগরের বাইরে। গৌতম বুদ্ধের আদেশই ছিল যে ভিক্ষুরা শহরের বাইরে বাস করবেন। কিন্তু, নগরের উৎপত্তি যে ভাবেই হোক না কেন, সেখানে বাজার স্থাপনা ছিল আবশ্যক।

ভারতবর্ষে নগরের উদ্ভব হয় খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক 2350-এ, হরপ্পাকালীন ব্রোঞ্জ যুগে। খ্রীষ্টপূর্ব 1750 নাগাদ নগরগুলির পতন হয় এবং খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক 500 অব্দে মধ্যগাঙ্গেয় সমভূমিতে আবার এদের পুনরুত্থান ঘটে। পূর্ব উত্তরপ্রদেশ ও বিহার সমভূমি এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমগ্র উপমহাদেশকে ধরলে এটি ছিল নগরায়নের দ্বিতীয় পর্যায়। কিন্তু শুধু গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলকে বিবেচনা করলে এটি ছিল নগরায়নের প্রথম ধাপ। হরপ্পা যুগ ও পরবর্তীকালে গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের নগরায়নের মধ্যে পার্থক্য ছিল। একটি পার্থক্য হল ভৌগোলিক। সিন্ধু উপত্যকা সহ হরপ্পা অঞ্চল ছিল শুষ্ক। এটি ছিল এক ধরনের মরুভূমি জাতীয় অঞ্চল যেখানে বর্ষণ ছিল কম ও আবহাওয়া শুষ্ক। হরপ্পা অঞ্চলে বন্যা হত, জলপ্লাবিত হত সমগ্র এলাকা, কিন্তু মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকার মত সেখানে পলিমাটি জমত না। তা ছাড়া মধ্য গাঙ্গেয় অঞ্চলে যে রকম ঘন অরণ্যাণী, বিশেষ করে বিশাল বৃক্ষরাজি দেখা যেত, হরপ্পায় সবসময়েই তার অভাব ছিল। হরপ্পা অঞ্চলে বর্ষণ কম হওয়ায় সেখানে ঘন জঙ্গল ছিল না। ফলে গাছ কাটার কঠিন সমস্যাও সেখানে দেখা দেয় নি। অন্যদিকে প্রবল বর্ষণের ফলে গাঙ্গেয় সমভূমিতে ঘন অরণ্য ছিল শুষ্ক, নীরস ও ছোট গাছপালা থাকায় হরপ্পায় ব্রোঞ্জ ও পাথরের হাতিয়ারে কাজ চলে যেত। এই সমস্ত হাতিয়ার দিয়ে বট এবং অন্যান্য বড় গাছ কাটা সম্ভব ছিল ও সেখানে ব্যাপকভাবে জনবসতি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু মধ্যগাঙ্গেয় সমভূমি পলিমাটিতে যে ঘন বনাঞ্চল ছিল লৌহনির্মিত হাতিয়ার ছাড়া তা পরিষ্কার করা সম্ভব ছিল না। গাছ কাটা সম্ভব হলেও গোড়া উপড়ে ফেলা কঠিন ছিল। এই জন্য ব্রোঞ্জ যুগে হরপ্পা অঞ্চলে জনপদ গড়ে ওঠে ও নগরের উদ্ভব হয় কিন্তু মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায় লৌহ যুগের পূর্বে জনবসতি স্থাপন করা সম্ভব হয় নি। লৌহ যুগে লৌহ হাতিয়ারের যথেষ্ট ব্যবহার লক্ষ করা যায় ও তা দিয়ে বনাঞ্চল পরিষ্কার করা হত। এই পলিজমিতে লোহার ফাল ব্যবহার করে সাধারণ কৃষক এত বেশি পরিমাণ ফসল উৎপাদন করত যে তার পরিবারের ভরণপোষণের পরেও অনেক উদ্বৃত্ত হত। এই উদ্বৃত্ত উৎপাদন দিয়েই নগরে বসবাসকারী শাসকবৃন্দ, পুরোহিত, শিল্পী, কারিগর, সৈনিক প্রভৃতির অন্নসংস্থান হত। এই উদ্বৃত্ত নগরবাসীর জন্য সংগৃহীত হত কর হিসাবে, পুরোহিতের দান-দক্ষিণা রূপে অথবা গ্রাম ও নগরের মধ্যে বাণিজ্যের লভ্যাংশ রূপে। নগরে বসবাসকারী শাসকবৃন্দ গ্রামাঞ্চল থেকে কর আদায় করে তা বেতন, পারিশ্রমিক বা দক্ষিণা হিসাবে বণ্টন করে দিত। অন্যভাবে বলতে গেলে, মধ্যগাঙ্গেয় সমভূমিতে নগরের উদ্ভবের এক আদর্শ প্রেক্ষাপট সৃষ্ট হয়।

এই অঞ্চলের জলবায়ু সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলের শুষ্ক ও নীরস জলবায়ুর থেকে ভিন্ন ছিল।

অপর পার্থক্যটি ধাতবমুদ্রা ব্যবহারের ক্ষেত্রে। ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতায় মেসোপটেমিয়ায় রৌপ্যখণ্ডের ব্যবহার চালু ছিল। কিন্তু একে মুদ্রা বলা যায় না। এই খণ্ডগুলি ওজন করে দেখা হত ও ধাতু খাঁটি কিনা প্রতি পদে তার পরীক্ষার প্রয়োজন হত। রাষ্ট্রের দ্বারা জারি করা না হলে ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি না দেওয়া হলে কোনও ধাতু-খণ্ডের প্রচলন সম্ভব ছিল না। খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকের শেষে প্রকৃত মুদ্রার আগমন ঘটে। প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য অনুযায়ী ভারতীয় উপমহাদেশে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের পূর্বে মুদ্রার প্রচলন হয় নি। মুদ্রার নিজস্ব কোনও গুরুত্ব নেই কিন্তু মুদ্রার প্রচলন এক বিশেষ ধরনের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে নির্দেশ করে। মুদ্রার প্রচলন পণ্য উৎপাদন ও বন্টনের লক্ষণ বহন করে। কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যের বন্টনের ক্ষেত্রে দালালরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। অর্থাৎ মুদ্রা ব্যবহারের ফলে বাণিজ্য প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। মুদ্রার প্রচলনের বিনিময় অথবা লেনদেনের কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। গবাদি পশু বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে সুবিধাজনক ছিল না। ধাতুমুদ্রা সহজে বিনষ্ট হয় না। এর সংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস করা সুবিধাজনক। এর দ্বারা হিসাবপত্র রাখাও সহজ। মুদ্রা স্থানান্তরে বহন করা সহজ ছিল, গবাদি পশুর ক্ষেত্রে যা সম্ভব ছিল না। মুদ্রার দ্বারা অর্থমূল্যে কর সংগ্রহ ও আমলাদের বেতন প্রদান সম্ভব ছিল, যার ফলে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা যেত। মুদ্রা প্রচলনের ফলে রক্তের সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে ও অর্থের সম্পর্ক দৃঢ় হয়। রাজার পক্ষে আত্মীয় পরিজনের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার আর প্রয়োজন রইল না। অর্থের বিনিময়ে এখন তিনি উপযুক্ত ব্যক্তির সহায়তা পেতে পারতেন। মনে রাখা প্রয়োজন মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায় নগরগুলিতে মুদ্রার প্রচলন ছিল ব্যাপক যেখানে হরপ্পা সভ্যতায় মুদ্রা ছিল অনুপস্থিত।

হরপ্পীয় ও গাঙ্গেয় নগরের মধ্যে অপর গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য তাদের স্থায়িত্বের মেয়াদ। হরপ্পীয় নগর খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক 2350 অব্দ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব 1750 অব্দ পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় 600 বছর স্থায়ী হয়। হরপ্পা সভ্যতার কিছু ধ্বংসাবশেষ খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক 1300 অব্দ পর্যন্ত পাওয়া যায় যাকে ইংরেজিতে 'লেট হরপ্পান' বলা হয়। কিন্তু এই সামান্য অবশিষ্টাংশগুলি থেকে নগরজীবনের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে কোনও ধারণা জন্মায় না। বিস্ময়জনকভাবে, হরপ্পীয় নগরগুলি ধ্বংস হওয়ার পর অন্তত এক হাজার বছরের বেশি সময় ধরে ভারতীয় উপমহাদেশের ওই অংশে কোনও নগরের উদ্ভব ঘটে নি। এর থেকেও বেশি আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে হরপ্পার অবসান হলে উপমহাদেশ থেকে পোড়া মাটির ইঁটও অদৃশ্য হয়ে যায়। হরপ্পা অঞ্চলে বা দেশের অন্য ভাগে মৌর্য যুগের উত্থানের পূর্বে পাকা ইঁটের আর দেখা মেলে নি।

অন্যদিকে গাঙ্গেয় উপত্যকার নগরজীবনের সূচনা হয় খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক 500 অব্দে এবং এটি কখনও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় নি। উদ্ভব থেকে শুরু 300 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এর প্রগতি ছিল অবাধ। পরবর্তীকালে অধিকাংশ নগরেরই পতন হয় ও কিছু কিছু

নগরের গুরুত্ব হ্রাস পায়। কিন্তু সীমিত আকারে বা পুনরুজ্জীবিত রূপে যেভাবেই হোক দ্বাদশ শতক ও তার পরেও নগরজীবনের অস্তিত্ব বজায় থাকে। চতুর্দশ শতকে এর অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়। হরপ্পীয় ক্ষেত্রে এ সব কিছুই ঘটে নি।

হরপ্পীয় নগরায়নের সঠিক বিচার ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতার প্রেক্ষাপটেই হওয়া সম্ভব। উত্তর পশ্চিম ভারত থেকে শুরু করে আফগানিস্থান, ইরান ও মধ্য এশিয়া পর্যন্ত, আবার পশ্চিম এশিয়া থেকে শুরু করে মিশর ও গ্রীস পর্যন্ত এই সভ্যতা বিস্তার লাভ করে। এই সমগ্র অঞ্চল ছিল ব্রোঞ্জ যুগের একটি সুসংবদ্ধ ভৌগোলিক পরিসীমা। এখানে বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এই সমগ্র অঞ্চলে হরপ্পার নগরজীবনের বিশেষত্বগুলি অন্যান্য নগর সভ্যতার মধ্যেও লক্ষ করা যায়। অতএব ব্রোঞ্জ যুগের প্রতিবেশী নগরজীবনের সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্রভাবে হরপ্পীয় নগরজীবনের বিচার সম্ভব নয়। কিন্তু হরপ্পার নগরজীবনের কোনও নিদর্শন পরবর্তীকালে কেন আর পাওয়া গেল না, এই প্রশ্নের সদুত্তর আজও মেলে নি।

ঐতিহাসিক পর্বে খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক 500 অব্দে নগরের উদ্ভব হলেও প্রথম প্রথম এই নগরগুলির বস্তুগত জীবনের মান খুব উন্নত ছিল না। মধ্য গঙ্গার তীরে কৌশাম্বী, বারাণসী, খৈরাডিহ্, বৈশালী, রাজগৃহ, চম্পার মতো নগরের উদয় হয়। কিন্তু এখানে মাটির বাড়ি তৈরি হত, যতদূর মনে হয়, খড়ের ছাউনি দিয়ে। কাঠের বাড়িও নির্মিত হত। মৌর্য যুগের পূর্বে গৃহ নির্মাণে পোড়া ইঁট ব্যবহৃত হত না। খ্রীষ্টপূর্ব 200 অব্দের পূর্বে পাকা খাপড়ার ব্যবসাও চালু ছিল না। কিন্তু সেখানে উত্তরের উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ পাত্র (North Black Polished Ware) ও অঙ্কযুক্ত রৌপ্যমুদ্রার আবিষ্কার থেকে মনে হয় যে নগরজীবনের বস্তুগত মান ছিল উঁচু। এর সঙ্গে মূল্যবান পাথরের তৈরি ক্ষুদ্র পুঁতি পাওয়া যায়। লৌহ হাতিয়ার ও ছোট ছোট ইঁটভাটাও পাওয়া গেছে। এছাড়া মৌর্য যুগের প্রারম্ভের চক্রাকার কূপও পাওয়া গেছে। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় পোড়া মাটির চক্র বেষ্টিত কূপের মত গর্ত দেখা গেছে। এগুলি শৌচালয় হিসাবে ব্যবহৃত হত অথবা দূষিত জল ও আবর্জনা এখানে জমা করা হত। পালি গ্রন্থ থেকে জানা যায় গৌতম বুদ্ধের সময়ে বিভিন্ন ধরনের শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা নগরে বাস করত ও নিজ নিজ পল্লী গড়ে তুলত। সমবায় সংঘ ও নিগমগুলিতে তারা সংগঠিত হত। নিগমের আক্ষরিক অর্থ বহির্গমন। পালি ভাষায় নগরকে 'নিগম' ও গ্রামাঞ্চলকে 'জনপদ' বলা হত। পালি গ্রন্থগুলিতে 'নিগম' ও 'জনপদ' শব্দদ্বয়ের বারবার উল্লেখ আছে।

প্রাথমিক অবস্থায় নগর ছিল যাতায়াতের কেন্দ্র। অধিকাংশ নগর গড়ে ওঠে নদীতীরে অথবা হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে। তরাইয়ের নদীগুলি ক্ষীণকায়া হাওয়ায় পারাপার করা সহজ ছিল ও তরাইয়ের পার্শ্ববর্তী পথগুলি চলাফেরার জন্য ব্যবহৃত হত। মৌর্য যুগে নতুন পথ নির্মিত হয়। পাটলিপুত্র থেকে তক্ষশিলা পর্যন্ত রাজপথ নির্মাণ করা হয়। এই পথ বারাণসী, কৌশাম্বী ও মথুরা হয়ে তক্ষশিলা পর্যন্ত পৌঁছত। এই রাজপথ শ্রাবস্তীর ওপর দিয়েও যেত। কৌশাম্বী হয়ে যে পথ মথুরা যেত, তা সেখান থেকে বিদিশা ও উজ্জয়িনীর ওপর দিয়ে পশ্চিম উপকূলবর্তী ভৃগুকচ্ছ বা ভরুচ

বন্দর পর্যন্ত চলে যায়। একই রকম ভাবে পাটলিপুত্রের আরও পূর্বে গঙ্গা বরাবর পথ চম্পা হয়ে বাংলাদেশের তাম্রলিপ্তি বন্দর পর্যন্ত চলে যায়। এ কথা স্পষ্ট যে এই স্থানগুলি সবই যাতায়াতের পথপার্শ্বে অবস্থিত ও এগুলি নগর হিসেবে গড়ে ওঠে। উৎখননের ফলে জানা যায় যে মৌর্য যুগে এই নগরগুলিতে জনবসতি ছিল।

নগরজীবনের সূচনা হয় খ্রীষ্টপূর্ব 500-এর পূর্বে যদিও খ্রীষ্টপূর্ব 200 ও খ্রীষ্টিয় 300-এর মধ্যে তা উন্নতির শিখরে পৌঁছয়। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে জানা যায় এই সময়ে শুধু মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকা নয়, উত্তর-পূর্বাংশ বাদ দিয়ে দেশের সর্বত্রই নগর গড়ে ওঠে। এই সময়েই রোমের সঙ্গে এক সমৃদ্ধ বাণিজ্য চলছিল ও এই সময়েই কুষাণরা মধ্য এশিয়া ও ভারতীয় উপমহাদেশকে এক সূত্রে গেঁথে রাখে। চীন থেকে শুরু হয়ে পশ্চিম দিকে ইয়োরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত সুবিখ্যাত রেশম পথের (Silk Route) এক বড় অংশই কুষাণ সাম্রাজ্যের ভিতর দিয়ে যায়। এই পথেই কাঁচা রেশম, রেশমের সুতো, ও রেশম বস্ত্রের ব্যবসা চলত। এর থেকে কিছু পণ্য আফগানিস্থান হয়ে ভারতে আসত ও ভৃগুকচ্ছ বন্দর থেকে তা রপ্তানী হত। খ্রীষ্টিয় প্রথম শতকগুলিতে রোমের সঙ্গে ব্যাপক বাণিজ্য চালু ছিল ও বাণিজ্য চলত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গেও। মধ্য এশিয়ার সঙ্গে সমৃদ্ধ বাণিজ্যের ফলে উত্তর ভারতে, এবং রোম ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের ফলে দক্ষিণ ভারতে নগরের বিকাশ ঘটে।

মৌর্যোত্তর যুগের গ্রন্থে বিভিন্ন রকম শিল্পের উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে রচিত *মিলিন্দপঞ্হো*-য় 75টি বৃত্তির উল্লেখ আছে। এর সবগুলিই শাকল বা শিয়ালকোটে দেখা গাছে। খ্রীষ্টিয় প্রথম শতক নাগাদ রচিত *মহাবস্তু*তে রাজগৃহ ও কপিলাবস্তু, এই দুটি স্থানে স্বতন্ত্রভাবে 100টি বৃত্তির উল্লেখ আছে। *মহাবস্তু*তে গৌতম বুদ্ধের সময়ের বর্ণনা পাওয়া যায় যখন রাজগৃহ মগধের ও কপিলাবস্তু শাক্যদের রাজধানী ছিল। কিন্তু বাস্তবে এই বৃত্তিগুলির অধিকাংশই পরবর্তীকালের বলে মনে হয় ও এও সম্ভব যে তারা অন্য নগরের সঙ্গেও যুক্ত ছিল। কোনও সন্দেহ নেই যে একটি বৃত্তির বিকাশের প্রক্রিয়ায় লোকে তার স্বতন্ত্র শাখাগুলিতেও ব্যুৎপত্তি অর্জন করে। যেমন ধনুক নির্মাণের ক্ষেত্রে কেউ ছিলা, কেউ তীর, কেউ শুধুমাত্র ধনুক তৈরি করত। সেই রকম রঞ্জনীশিল্পে কোনও কারিগর নিযুক্ত ছিল বয়নের কাজে, কেউ রং প্রস্তুত করা আবার কেউ রং করার কাজে। প্রত্যেক শিল্পের পৃথক পৃথক শাখা ছিল। উৎখননের ফলে অধিকাংশ শিল্পেরই নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। উৎখননের ভিত্তিতেই জানা যায় বিভিন্ন ধরনের মৃৎশিল্পী, হাতির দাঁতের কাজ করে এমন শিল্পী, রঞ্জক, তন্তুবায়, কাঁচশিল্পী, লৌহশিল্পী এবং বিভিন্ন ধরনের ইঁট ও খাপড়া প্রস্তুতকারীরা এই নগরগুলিতে বাস করত।

খ্রীষ্টপূর্ব 200 থেকে খ্রীষ্টিয় 300 অব্দ পর্যন্ত শিল্প ও বাণিজ্যের পক্ষে বিহারের চম্পা, পাটলিপুত্র, বৈশালী, কাটরাগড় ও চিরান্দ প্রভৃতি নগরের পরিস্থিতি অনুকূল ছিল। বিশেষ করে ইলাহাবাদের কাছে ভীটা ও বৈশালীতে শিল্পী ও কারিগরদের অনেক সীলমোহর পাওয়া গেছে। এগুলি গুপ্ত যুগের বলে মনে করা হয়। সীলমোহরে খোদাই

করা অক্ষরগুলি সঠিকভাবে বিচার করলে অনেকগুলি প্রাক্ গুপ্ত যুগের বলে মনে হবে। কুষাণ যুগের পোড়া ইঁটের বাড়ি পাটলিপুত্র, বৈশালী ও চিরান্দে পাওয়া গেছে। উত্তরপ্রদেশের নগরগুলিতেও অনুকূল অবস্থা ছিল। খৈরাডিহ্, রাজঘাট ( বারাণসী ), শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী, অঞ্জিখেরা ও মথুরায় মৌর্যোত্তর যুগের সমৃদ্ধ বস্তুগত জীবনের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। দাক্ষিণাত্য তথা দক্ষিণ ভারতের পরিস্থিতি প্রায় একই ছিল। মহারাষ্ট্রের টের ( টগর ) ও ভোকরদন ( ভোগবর্দ্ধন ) এও পরিস্থিতি একই রকম ছিল। উত্তর কর্ণাটকের বড়গাঁও- মাধবপুরে উৎখননের ফলে জানা যায়, মহারাষ্ট্রের নগরগুলির মত সাতবাহন সাম্রাজের এই নগরটিও সমান উন্নত ছিল। কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্র ছাড়াও অন্ধ্রেও অনেক প্রত্নস্থলে উৎখননের ফলে সাতবাহন যুগের উন্নতমানের নগরসভ্যতার নিদর্শন চোখে পড়ে। তামিল অঞ্চলের অরিকমেডু ও কাবেরীপট্টনমে উৎখনের ফলে খ্রীষ্টিয় প্রথম শতকগুলিতে গড়ে ওঠা সমৃদ্ধ বন্দরের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই বন্দর দিয়ে রোমের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চলত।

এই লেখকের *আরবান ডিকে ইন ইন্ডিয়া* গ্রন্থে সোয়াশোরও বেশি প্রত্নস্থলের আলোচনার ভিত্তিতে দেখান হয়েছে প্রাচীন ভারতে খ্রীষ্টপূর্ব 200 অব্দ থেকে খ্রীষ্টিয় 300 পর্যন্ত নগরজীবন চরম উৎকর্ষ অর্জন করে। অধিকাংশ স্থলেই বিভিন্ন ধরনের লৌহ উপকরণ ও তার সঙ্গে চুল্লী আবিষ্কৃত হয়েছে। বহুসংখ্যক সীলমোহর, শাঁখের জিনিস, বিভিন্ন প্রকার অলংকার ও অপরূপ মৃন্ময় মূর্তিও পাওয়া গেছে। উৎখননের ফলে মুদ্রা বেশি সংখ্যায় পাওয়া যায় নি। যেখানে মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলি পাওয়া গেছে নগরের পুরনো অংশে অথবা তার আশেপাশে। মুদ্রার অনেক ছাঁচ পাওয়া গেছে। এই সব ছাঁচ প্রায় চল্লিশটি পুরনো নগরে আবিষ্কৃত হয়েছে। সমুদ্র উপকূলবর্তী নগরগুলিতে দোকান ও গুদামঘরও পাওয়া গেছে। আর পাওয়া গেছে বিলাসবহুল ও সম্মানসূচক দ্রব্যাদি, যেমন মহামূল্য পাথরের তৈরি পুঁতি, কাঁচ ও হাতির দাঁতের জিনিস ও বিভিন্ন ধরনের রোমান বাসন। কিন্তু পোড়া ইঁট ও খাপড়ার ব্যবহার প্রচলিত থাকলেও কোনও বড় ইমারতের খোঁজ পাওয়া যায় নি। সিন্ধু সভ্যতার দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে বড় ইমারতকে নগরজীবনের অন্যতম লক্ষণ হিসাবে দেখা হয়। কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য যদি চলতে থাকে, নানা ধরনের শিল্পের দ্বারা উৎপাদন হতে থাকে ও কোনও এক স্থানে যথেষ্ট সংখ্যক লোক বাস করতে থাকে সে ক্ষেত্রে তাকে নগর বলা যেতে পারে। অতএব বড় ইমারত না পাওয়া গেলেও মৌর্যোত্তর যুগে সাধারণভাবে নগরজীবন উন্নতমানের ছিল।

মৌর্যোত্তর কালে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যের ফলে নগরজীবনে উৎকর্ষ সাধিত হয়। রোমের সঙ্গে ভারতের জোরদার বাণিজ্য চলছিল। উৎখননের ফলে ভারতীয় উপদ্বীপের অনেক নগরে রোমান পাত্র ও কাঁচের জিনিসের প্রাপ্তি এর প্রমাণ। রোমান মুদ্রা বহু সংখ্যায় না পাওয়া গেলেও তার নমুনা একশোরও বেশি স্থানে পাওয়া গেছে। সব মিলিয়ে রোমান স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার সংখ্যা 6000 হবে। মুদ্রার মোট সংখ্যার এটি একটি ক্ষুদ্র অংশ। বাণিজ্যই ছিল নগরজীবনের উৎকর্ষের কারণ এবং মুদ্রার ব্যাপক

ব্যবহার প্রমাণ করে যে বাণিজ্যেরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। প্রায় 35টি এমন স্থান ছিল যার নামে স্বতন্ত্র মুদ্রা পাওয়া যায়। এরন, কৌশাম্বী, বারাণসীর মত অনেক নগরের নাম সেখানকার মুদ্রায় উল্লিখিত আছে। এর থেকে মনে হয়, এই নগরগুলিতে টাঁকশাল ছিল। আবার কুষাণ, সাতবাহনের মত অনেক রাজবংশ নিজেদের মুদ্রার প্রচলন করে। অনেক উপজাতীয় রাজ্যের মুদ্রাও পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রকার মুদ্রার যথাযথ অনুসন্ধান করলে জানা যাবে যে মৌর্যোত্তির কাল থেকে গুপ্ত যুগের সূচনা পর্যন্ত প্রাপ্ত মুদ্রার সংখ্যা ছিল সবাধিক। একথা ঠিক যে স্বর্ণমুদ্রার সংখ্যা বেশি নয়। অধিকাংশ মুদ্রাই তামা, কাঁসা, দস্তা ও পোটিন নির্মিত। হায়দ্রাবাদের রাষ্ট্রীয় সংগ্রহশালায় শুধু সাতবাহনদেরই 50,000 মুদ্রা আছে। এর থেকে সমকালীন শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। অতএব শিল্প, বাণিজ্য, মুদ্রার প্রচলন, হাতিয়ারের ব্যবহার ও অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষের ভিত্তিতে বলা যায় যে মৌর্যোত্তির যুগে নগরজীবন তার উন্নতির শীর্ষে পৌঁছয়।

300 খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ নগরের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। অধিকাংশ নগর 300 খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ অবলুপ্ত হয়ে যেতে থাকলেও কিছু কিছু নগরের অস্তিত্ব 600 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত থাকে। তারপর সেগুলিও ধ্বংস হয়ে যায়। এমন নগর এদেশে খুব কমই আছে, উৎখনন থেকে যার অস্তিত্ব 1000 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল বলে মনে হয়।

সমাজের ক্ষেত্রে নগরায়নের সার্থকতা কী ছিল প্রাপ্ত নিদর্শনের ভিত্তিতে তা বিচার করা প্রয়োজন। নগরায়নের ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কি কোনও বড় পরিবর্তন ঘটেছিল ? এই প্রশ্নগুলির নানা রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। কারও কারও মতে প্রাচীনকালে নগরের মানুষ উন্নয়নমূলক কোনও কাজে অংশ নিত না, নগরে বসে কৃষকের উপার্জনের ওপর নির্ভর করে জীবন নির্বাহ করত। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এই পরজীবীদের কোনও ভূমিকা ছিল না। আবার ব্রোঞ্জ যুগের ওপর গবেষণারত কিছু প্রত্নতত্ত্ববিদ মনে করেন নগরের আবির্ভাবের পিছনে শিল্পের বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। তাঁদের মতে শিল্পের জন্য নগরের জন্ম হয় নি, বরং নগরের জন্যই শিল্পের জন্ম।

মনে হয় প্রাচীন নগরগুলিতে এমন অনেক শাসক, সৈনিক, পুরোহিত ও অন্যান্য রাজকর্মচারী বাস করত যাদের পরান্নভোজী বা পরাশ্রয়ী বলা যায়। এদের মধ্যে কিছু লোক উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত ছিল কিন্তু এরা নিজেরা কখনও প্রত্যক্ষভাবে এতে অংশ নিত না। তবে নিঃসন্দেহে বহুসংখ্যক শিল্পী ও হস্তশিল্পে যুক্ত বিভিন্ন ধরনের শ্রমিক নগরে বসবাস করত। তাদের ও ব্যবসায়ীদের ক্রিয়াকলাপের দরুন নগরগুলি বিনিময়, উৎপাদন ও প্রযুক্তির প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। সেইজন্য হস্তশিল্প ও খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে নগরের ভূমিকার কথা অস্বীকার করা যায় না। সব নগরকেই পরজীবী মনে করলে ভুল হবে। কিছু লোক পরজীবী হলেও অন্যেরা উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সেইজন্য প্রাচীন নগরগুলিকে উৎপাদক হিসাবে না দেখা সম্ভব নয়। নগরের জন্য রাজতন্ত্রের বনিয়াদ দৃঢ় হয়। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রে*র ভিত্তিতে অনুমান করা যায়, অর্থমূল্যে আদায়ীকৃত কর নগরে নিয়ে এসে তা থেকে রাষ্ট্রের আমলা ও কর্মচারীবৃন্দকে

'পণ' রূপে অর্থমূল্যে বেতন দেওয়া হত। এই ধরনের নগরগুলি কর সংগ্রহের কেন্দ্র ছিল। সেখানে বিশাল সেনাবাহিনী মোতায়েন থাকত ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের সেখান থেকে পারিশ্রমিক দেওয়া হত।

কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রে* র দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাষ্ট্রের আয়ের উৎসগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। উৎসগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়—(1) গ্রামাঞ্চল ( রাষ্ট্র ) থেকে প্রাপ্ত আয়, ও (2) সুরক্ষিত নগর ( দুর্গ ) ও রাজধানী থেকে প্রাপ্ত আয়। দুর্গ থেকে প্রাপ্ত 20 রকম রাজস্বের উল্লেখ আছে কিন্তু এর কত অংশ রাষ্ট্রের প্রাপ্য তা এখনও বলা সম্ভব নয়। রোমের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন ব্যবসা খাতে রোম সাম্রাজ্য শুধু 5% রাজস্ব পেত। শিল্পী ও কারিগরদের কাছ থেকে রাষ্ট্রের প্রাপ্য কী ছিল তা বলা হয় নি। প্রাচীন ভারতে নগর থেকে কী পরিমাণ আয় হত তা জানার উপায় নেই। কিন্তু কিছু প্রশ্ন তোলার প্রয়োজন আছে যেমন, মোট রাজস্বের কত অংশ গ্রামাঞ্চল থেকে আসত ? মোট রাজস্বের কত ভাগ নগরাঞ্চল থেকে পাওয়া যেত ? শিল্প ও বাণিজ্য থেকে রাষ্ট্রের কত আয় হত এবং কৃষি ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বৃত্তি থেকে কত পরিমাণ রাজস্ব সংগৃহীত হত ?

এই প্রশ্নগুলির জবাব না পাওয়া গেলেও প্রাচীন ভারতের অর্থব্যবস্থায় নগরের অবদানের প্রসঙ্গটি উপেক্ষা যায় না কারণ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে বহুসংখ্যক নগরবাসী যুক্ত ছিল। নগরের অর্থব্যবস্থা, রাজতন্ত্র ও সামাজিক সংগঠনগুলিকে প্রভাবিত করে। সৈনিক, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু, রাজকর্মচারী, কারিগর, ও ব্যবসায়ীর মত নগরবাসীর ভরণপোষণ চলত আদায়ীকৃত কর ও বিনিময় প্রক্রিয়ার দ্বারা । গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রেও নগরের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। যোগাযোগের অসুবিধার জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি থেকে উৎপন্ন দ্রব্য বহন করে আনা প্রায় অসম্ভব ছিল। উৎপাদনক্ষম পশ্চাদ্‌ভূমি না থাকলে নগরে অর্থব্যবস্থার পরিচালনা কঠিন হত। মনে হয় গ্রামীণ পশ্চাদ্‌ভূমিতে বসবাসকারী মানুষ পার্শ্ববর্তী নগরের অধিবাসীদের জন্য খাদ্য সামগ্রী যোগান দিত। ব্যবসায়ীদের সঠিক ভূমিকা কী ছিল তা এর থেকে জানা যায় না। পালি গ্রন্থে অবশ্য এমন দৃশ্যের উল্লেখ আছে যেখানে পাঁচশো গরুর গাড়িতে ব্যবসায়ী মালপত্র সাজিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এর থেকে মনে হয় নগরবাসী কারিগর কৃষকের জন্য কৃষি-সরঞ্জাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত করত। এর পরিবর্তে কৃষক তাদের খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করত। জাতকের একটি গল্পে বলা হয়েছে এক ব্যক্তি শহরে 500' লাঙলের ফাল জমা দিয়েছে। এই ফাল নিঃসন্দেহে কৃষকদের প্রয়োজনে লাগত।

প্রাচীন ভারতে নগরস্থাপনার ধাঁচ কেমন ছিল তার স্বরূপ নির্ণয় তখনই সম্ভব হবে যখন দেশে ব্যাপক ভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের কাজ হাতে নেওয়া হবে ও প্রত্নস্থলগুলির ও সযত্ন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হবে। তবে একথা বলা যায় যে ভারতের প্রাচীন নগরগুলি নদীতীরে অথবা বাণিজ্যপথের ধারে গড়ে ওঠে। প্রাক্-শিল্পাশ্রয়ী যুগে যাতায়াতের অসুবিধার জন্য নগরবাসী তার দৈনন্দিন প্রয়োজনের দ্রব্যাদি দূরদেশ থেকে নিয়ে আসতে পারত না। প্রতিটি নগরই মনে হয় অনেকগুলি গ্রামবেষ্টিত হত অর্থাৎ

গ্রামপুঞ্জের কেন্দ্রে এক একটি নগর গড়ে উঠত। দুটি গ্রামপুঞ্জের মধ্যে থাকত বনাঞ্চল। নগরের উপকণ্ঠে বনের উল্লেখ পালি গ্রন্থে আছে। কিন্তু নগরের বাসস্থান ও জনবসতি প্রভৃতি বিষয়ের অনুসন্ধানে আজও প্রত্নতাত্ত্বিক সহায়তার প্রয়োজন আছে। সেট্‌লমেন্ট আর্কিওলজির (Settlement Archaeology) উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয় নি। জনবসতির প্রসার, ধরন ও তার আপেক্ষিক জনসংখ্যা, বিভিন্ন পেশার লোক কোথায় কোথায় বাস করত, এ সব প্রশ্নে উত্তর খোঁজার প্রয়োজন আছে। নগর ও তার পশ্চাদ্‌ভূমির মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল তা জানার মত বস্তুগত নিদর্শনের খোঁজ পাওয়া যায় নি। এই তথ্যাবলির অভাবে প্রাচীন অর্থব্যবস্থায় ও প্রাচীন রাষ্ট্রব্যবস্থায় নগরের ভূমিকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায় না।

300 খ্রীষ্টাব্দের পর অধিকাংশ নগরের কেন পতন ঘটে তার কারণ অন্বেষণ করা কঠিন। তবে পতনের কিছু কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে। মুখ্য কারণ হল রোম ও ভারতবর্ষের সমৃদ্ধ বাণিজ্যের হ্রাস। ভারত ও অন্যান্য পূর্বাঞ্চলীয় দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের ফলে রোমান রাজকোষ শূন্য হয়ে যেতে থাকে। এই বাণিজ্যে গৃহে ব্যবহৃত লৌহ নির্মিত দ্রব্য ও রেশম রোমে আমদানি করা হত। এই দ্রব্যগুলি রোমে ছিল মহামূল্য। রোমান শাসকরা এসব দ্রব্যের বাণিজ্য নিষিদ্ধ করে দেন। খ্রীষ্টিয় তৃতীয় শতকের শেষে রোম-ভারত বাণিজ্যক সম্পর্ক শিথিল হতে থাকে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে পশ্চিম এশিয়ায় বিস্তৃত পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের কিছু মুদ্রা বিক্ষিপ্তভাবে ভারতীয় উপদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে। কিন্তু পুরনো রোমান মুদ্রার তুলনায় এর সংখ্যা নগণ্য। এই শতকগুলিতে ইতালীতে তৈরি বাসনপত্র, কাঁচের মত দ্রব্য পাওয়া যায় না। অতএব এতে সন্দেহ নেই যে আনুমানিক তৃতীয় শতকের শেষ থেকে রোমের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য প্রচুর পরিমাণে হ্রাস পায়। ঠিক এই সময়ে কুষাণ সাম্রাজ্যের পতন হলে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গেও ভারতের বাণিজ্য বড় রকম ধাক্কা খায়। রেশম পথ ( সিল্ক রুট বা সিল্ক রোড ) আনুমানিক 200 খ্রীষ্টাব্দের পর বন্ধ হয়ে যায়। এটি আবার নতুন করে চালু হয় চতুর্দশ শতকে যখন মোঙ্গলদের আগমন ঘটে। মধ্য এশিয় বাণিজ্যের জন্যই মথুরার সমৃদ্ধি ঘটেছিল। কিন্তু তৃতীয় শতকের পর এই সমৃদ্ধির অবসান হয়। একই কারণে খ্রীষ্টিয় চতুর্থ শতকের শেষে তক্ষশিলা নগরীও পতনোন্মুখ হয়ে পড়ে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু বড় পরিবর্তনের প্রভাব নগরের ওপর পড়ে। খ্রীষ্টিয় তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন সাম্রাজ্য ও উত্তর ভারতের কুষাণ সাম্রাজ্য অবলুপ্ত হয়। রাজনৈতিক এককগুলি বৃহদায়তন হওয়ায় নগরবাসীর অন্নসংস্থানের জন্য গ্রাম থেকে কর সংগ্রহ করা সহজ ছিল। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় নগরে শিল্পের অগ্রগতি ঘটে। এক বিশাল অঞ্চল জুড়ে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় থাকলে ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা হয়। বণিকদের ক্ষুদ্র রাজ্যের নৃপতি ও সর্দারদের পথকর দেওয়ার প্রয়োজন হত না। সাতবাহন ও কুষাণদের সার্বভৌমত্ব

যতদিন প্রতিষ্ঠিত ছিল মোট লভ্যাংশ ছিল তাদেরই প্রাপ্য। কিন্তু এই সাম্রাজ্যগুলির অবসান ঘটলে কিছুদিনের ব্যবধানে নগরগুলিও অবলুপ্ত হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতে জানা যায় অন্ধ্র, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, ও মধ্যপ্রদেশের বহু নগর সাতবাহন যুগে সমৃদ্ধিশালী ছিল কিন্তু এদের পতনের পর নগরগুলিরও অস্তিত্ব লোপ পায়। প্রায় একই পরিস্থিতি উত্তর ভারতে কুষাণ যুগের নগরের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়।

খ্রীষ্টিয় তৃতীয় শতকের শেষে নগরগুলির পতনের সঙ্গে সমকালীন সামাজিক সঙ্কটের প্রশ্নটিও যুক্ত। কোনও কোনও পুরাণে কলিযুগের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা খ্রীষ্টিয় তৃতীয় শতকের শেষ ও চতুর্থ শতকের সূচনা—এই কালসীমার সম্পর্কে লেখা বলে মনে করা হয়। বলা হয়েছে যে কলিযুগে বর্ণসংকরের সৃষ্টি হবে যার ফলে লোকে স্বীয় বর্ণধর্ম পালন করতে অস্বীকার করবে। সবারই জানা আছে যে প্রাচীন সমাজে বৈশ্য ও শূদ্রের সংখ্যা ছিল প্রচুর। বৈশ্যদের অধিকাংশই কৃষিকার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল ও তারা বাণিজ্যও করত। বৈশ্যরা ছিল প্রধান করদাতা। উচ্চবর্ণের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বৈশ্য ও শূদ্রের বিদ্রোহের আভাস মেলে। এই বিদ্রোহের জন্য কর আদায় কঠিন হয়ে পড়ে। কর আদায় না হওয়ায় ব্রাহ্মণাদিসহ রাজকর্মচারী ও অন্যান্য নগরবাসীর ভরণপোষণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। মনে হয় মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশের মত অঞ্চলে এই বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় কারণ এসব অঞ্চলে বর্ণব্যবস্থা সেরকম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না। এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে নৃপতিগণ ব্যপকভাবে ভূমিদানের ব্যবস্থা করেন। ভূমিদান সংক্রান্ত লেখ মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রে প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছে। চতুর্থ শতকের এই লেখগুলিতে বাকাটক ও পল্লবরাজাদের 'ধর্মমহারাজ'[2] অর্থাৎ বর্ণধর্মের পালক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ধীরে ধীরে ভূমিদান ব্যবস্থা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ভূমিদানের প্রচলন হওয়ায় শিল্প ও বাণিজ্য গুরুত্ব হারায়, মুদ্রার ব্যবহার হ্রাস পায়। এই ঘটনাগুলির প্রতিকূল প্রভাব নগরজীবনের ওপর পড়ে।

ধীরে ধীরে দান প্রথার এত ব্যাপক প্রচলন হয় যে গুপ্ত যুগের অবসানকালে দোকান, এমনকি নগরও দান করা হতে থাকে। লেখ ও হিউয়েন সাঙের বৃত্তান্তে দানের উল্লেখ পাওয়া যায়। দোকান, নগর ও গ্রামদানের ফলে ব্যবসা বাণিজ্য ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যবসায়ী আর আগের মত স্বাধীনভাবে কারবার পরিচালনায় সক্ষম হয় না। এইভাবে নগরগুলির একপ্রকার সামন্তীকরণ ঘটে যায়।

কিন্তু প্রাচীন নগরগুলির গুরুত্ব হ্রাসের অর্থ এই নয় যে দেশের অর্থনৈতিক প্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়। ভূমিদান সংক্রান্ত লেখগুলি থেকে জানা যায়, পঞ্চম থেকে সপ্তম শতকের মধ্যে ভারতবর্ষে প্রায় 50টি রাষ্ট্র ছিল। এই রাষ্ট্রগুলির আবির্ভাব এমন সব অঞ্চলে হয় যেখানে ইতিপূর্বে কোনও রাষ্ট্রব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল না। এই প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের নিজস্ব সেনাবাহিনী, প্রশাসনিক সংগঠন ও বিচারপতি ছিল। এই ব্যবস্থার দ্বারা রাষ্ট্র জনসাধারণের ওপর সার্বভৌমত্ব বজায় রাখে। এটি সুস্পষ্ট যে গ্রামাঞ্চল থেকে আদায়ীকৃত কর ব্যতিরেকে রাষ্ট্রগুলি নিজেদের সার্বভৌম সত্তা বজায় রাখতে পারত

না। অতএব বহুসংখ্যক রাষ্ট্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষ করে গুপ্তোত্তর যুগে, কৃষির ব্যাপক প্রসার ঘটে ও সেই সঙ্গে গ্রামাঞ্চলও বিস্তার লাভ করে।

মনে হয় নগরের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় প্রযুক্তিগত জ্ঞানের প্রসার ঘটে। শিল্পীরা নগর পরিত্যাগ করে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কোনও প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যের দ্বারা একথা প্রমাণ করা যায় না কারণ গ্রামাঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও তার বিচারের কাজ এখনও হাতে নেওয়া হয় নি। কিন্তু এরকম অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। রেশম বাণিজ্য হ্রাস পাওয়ায় পঞ্চম শতকে গুজরাটের রেশমশিল্পীরা নিজেদের নগর পরিত্যাগ করে মালবের মান্দাসোর শহরে চলে যায়। এই ঘটনাকে একেবারে নগর ছেড়ে চলে যাওয়া বলা যায় না, গেলেও নগরজীবনের অবক্ষয় ঘটলে জীবিকার সন্ধানে শিল্পীদের অন্যত্র চলে যাওয়া স্বাভাবিক বলেই মনে হয়।

প্রাচীন নগরগুলির অবক্ষয় শুরু হলে ব্রাহ্মণও তার জীবিকার প্রয়োজনে শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে চলে যায়। সেখানে তারা লিখিত ও মৌখিকভাবে কৃষি-সংক্রান্ত জ্ঞান বিতরণ করতে শুরু করে। গুপ্তোত্তর যুগে বহুসংখ্যক ভূমিদান গ্রহীতা ব্রাহ্মণের আদি বাসস্থানের উল্লেখ লেখগুলিতে পাওয়া যায়। আদি বাসস্থানগুলির অধিকাংশই ছিল নগরাঞ্চলে অবস্থিত। বিশেষ করে পঞ্চম থেকে অষ্টম শতকের মধ্যে গুজরাটের দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে লেখতে বলা হয়েছে যে জমিজমা ভোগ করার আশায় তারা নগর ত্যাগ করে গ্রামাঞ্চলে চলে গেছে। এই ব্রাহ্মণরা কৃষি-সম্পর্কিত পঞ্জিকাগত জ্ঞান বিতরণ করত বলে মনে হয়, যার ফলে কৃষিকার্যের সুবিধা হত। সেইজন্য কারিগর ও ব্রাহ্মণদের নগরত্যাগের ফলে গ্রামাঞ্চলে প্রযুক্তিগত কৃৎকৌশল বিস্তার লাভ করে। কিন্তু নগরের মত গ্রামগুলি এই প্রযুক্তিগত কৃৎকৌশলের কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে নি। প্রযুক্তির যৎসামান্য প্রসার গুপ্তোত্তর কালে দেখা যায়, ঠিক যেমন ছিল মুদ্রার ক্ষেত্রে। কৃষির প্রসারের ফলে জনবসতি প্রচুর বৃদ্ধি পায় কিন্তু সেই অনুপাতে মুদ্রা খুবই সামান্য পাওয়া গেছে। পঞ্চম থেকে নবম শতকের মধ্যে কারিগর ও বাণিজ্যিক সমবায় সংঘগুলির সীলমোহর ও তার ছাঁচ প্রায় অদৃশ্য হয়ে যায়, যদিও প্রাচীন যুগের সীলমোহর ও ছাঁচ বহু সংখ্যায় পাওয়া গেছে। পূর্ব ভারতের বৌদ্ধ মঠগুলিতে আদি মধ্যযুগের বহুসংখ্যক সীলমোহর আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে এর থেকে শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কে কোনও ধারণা করা যায় না।

এই ভাবে আদি মধ্যযুগে এক ধরনের নতুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর উদয় হয়, যেখানে ভূমিদানের ব্যপক প্রচলনের ফলে এক প্রভাবশালী শ্রেণী হিসাবে ভূস্বামীদের আবির্ভাব হয়। সম্ভবত বিভিন্ন রাষ্ট্রে পুরোহিত ও অধিকাংশ পদস্থ রাজকর্মচারীকে পারিশ্রমিক দেওয়া হত ভূমিদানের মাধ্যমে। ভূমিদান প্রথার ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের গুণগত পরিবর্তন ঘটে। ব্যবসা বাণিজ্য যতদিন বৃদ্ধি পেয়েছিল ও নগরের অস্তিত্ব যতদিন বজায় ছিল, ততদিন দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য অর্থমূল্যে নিধারিত হত। সেই কর্মচারীদের বেতনও যত দূর সম্ভব অর্থের মাধ্যমে প্রদত্ত হত। কিন্তু বাণিজ্য ও নগরের গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ায় দ্রব্যসামগ্রী ও পরিষেবার

মূল্য অর্থে নির্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও মুদ্রায় তা মেটানো কঠিন হয়ে পড়ে। এখন তা ভূমি বা উৎপন্ন দ্রব্যে মেটানো হতে থাকে। এই ভাবে যজমানী প্রথা, যা সীমিত আকারে পাণিনির সময়ে প্রচলিত ছিল, মধ্যযুগে বিস্তার লাভ করে। গ্রামের কৃষক অথবা ভূম্যধিকারী যদি কর্মকার, মৃৎশিল্পী, তৈল ব্যবসায়ী, পরামাণিক বা পুরোহিতের পরিষেবা গ্রহণ করত তবে তার পরিবর্তে বছরে দুবার ফসল কাটার সময়ে তাদের উৎপাদনের অংশ প্রদান করা হত। এই দিয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহ হত। আদি মধ্যযুগে স্বনির্ভর অর্থব্যবস্থা বলতে যা বোঝায় তার অস্তিত্ব না থাকলেও অধিকাংশ স্থানীয় প্রয়োজন স্থানীয় ভাবেই পূরণ করা হত। এই ধরনের ব্যবস্থা প্রায় 1000 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চালু ছিল। একথা ঠিক যে 500 থেকে 900 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দক্ষিণ ভারতে কিছু নতুন নগর গড়ে ওঠে ও খ্রীষ্টিয় নবম শতক থেকে রাজস্থানের কোনও কোনও অঞ্চলে নগরীয় ব্যবসা বাণিজ্য শুরু হয়। কিন্তু সমগ্র দেশের প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে প্রাচীন নগর ক্রমেই অবলুপ্ত হচ্ছিল। সমৃদ্ধ ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র অথবা প্রাচীন যুগের মত যেখানে মুদ্রা প্রচলন ছিল, এমন নগরের সংখ্যা ছিল নামমাত্র। একাদশ শতকের গোড়া থেকে নিশ্চিতভাবেই বাণিজ্য ও নগরজীবনের পুনরাবির্ভাব হয় কিন্তু উভয়েরই প্রকৃত পুনরুত্থান ঘটে চতুর্দশ শতকে।

## সূত্র

1. এই অধ্যায়টি নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলির ভিত্তিতে রচিত : Mc Robert Adams, "The Natural History of Urbanism" (1968) *Ancient Cities of the Indus*, ed. Gregory L. Possehl (Delhi, 1979), pp. 16-18 ; B. Gordon Childe, "The Urban Revolution," 1950, pp. 12-17 ; A Ghosh, *The City in Early Historic India,* Shimla, 1973 ; R. S. Sharma, *Urban Decay in India* (300-1000), Delhi, 1987.
2. D. C. Sircar, *Select Inscriptions,* Vol I, Part 3, No. 59., pp. 1-4.